Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইয়াসমিন ফারজানা

রোলঃ 227020001

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইয়াসমিন ফারজানা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইয়াসমিন ফারজানা
রোলঃ 227020001

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইয়াসমিন ফারজানা , আইডিঃ 227020001বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ইয়াসমিন ফারজানা

আইডিঃ 227020001

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

আত্মা কি?..5

আত্মার গুরুত্ব..6

আত্মার রোগের চিকিৎসা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা..6

আত্মার ব্যাধি সমূহ সম্পর্কে ধারণা..9

জবানকে সংযত না করা..9

ঝগড়া-ফাসাদ..12

মিথ্যা বলা..15

বিদ্বেষ..18

অহংকার..20

লোভ..23

কৃপণতা..23

ক্রোধ/রাগ..24

আত্মার ব্যাধিসমূহ হতে সুস্থতার জন্য পদক্ষেপ:..25

আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ : তাওবা..25

আত্মশুদ্ধির পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ ধৈর্য..27

মুজাহাদা বা সাধনা..30

দিল থেকে দুনিয়া বের করে দিন..34

আত্মার সুস্থতা জরুরী কেন?..35

আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা না করানোর ফল..37

আত্মা কি?

প্রত্যেক প্রাণীর শক্তি ও সামর্থ্য রুহ বা আত্মার মধ্যে লুকায়িত। রুহের অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে দেহ। যখন দেহ থেকে রুহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন দেহ থেকে প্রাণও চলে যায়।

পবিত্র কুরআনে অন্তত ২৩ বার 'রুহ' শব্দ এসেছে। বাংলা ভাষায় এর পরিচিত অর্থ হলো প্রাণ বা আত্মা। রুহ হলো সেই অলৌকিক বস্তু, যা মানুষের ভেতর ফুঁ দিয়ে প্রাণের সঞ্চার করা হয়। রুহ এমন অশরীরী বস্তু, যা কারো দৃষ্টিগোচর হয় না।

মুশরিক সম্প্রদায় যখন রূহের হাকীকত (প্রকৃত অবস্থা) সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলো, তখন তার উত্তরে একথাই বলা হয়েছিলো যে,

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً

অর্থাৎ, আপনি বলুন! এটি আমার প্রতিপালকের হুকুম মাত্র। (এর হাকীকত তোমরা জানতে পারবে না। কারণ) এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (বনী ইসরাঈল, ৮৫)

তাছাওউফ আমাদেরকে এতটুকু বলে যে, আত্নার এ গোপন জগত, মানুষের বাহ্যিক জগতের ভিত্তি। এই গোপন জগতের উপরই মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। যদি অন্তরের এ জগত পরিশুদ্ধ হয় এবং এর ব্যবস্থাপনা ঠিকভাবে চলে, এ অন্তরে সঠিক কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়, সহীহ-শুদ্ধ চিন্তার উদ্রেক হয়, তাহলে মানুষটিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা হবে।

আর যদি এ জগতের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে মানুষের বাহ্যিক জগতের ব্যবস্থাপনাও ব্যাহত হয়, বাধাগ্রস্ত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাস্তব কথাটিকেই আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت

فسد الجسد كله الا وهي القلب

অর্থাৎ, সাবধান! শরীরের মধ্যে এমন একটি গোস্তের টুকরা আছে, যদি এ গোস্তের টুকরাটি ভাল থাকে, তাহলে পূর্ণ শরীর ভাল থাকে। আর যদি এ গোস্তের টুকরাটি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে পূর্ণ শরীর খারাপ হয়ে যায়। সাবধান! ঐ গোস্তের টুকরাটির নাম হলো, ক্বলব বা অন্তর। (সহীহ বুখারী ১:১৩ সহীহ মুসলিম ২৪২৮)

আত্মার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা আত্মা নামের এক বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যার উপর মানুষের বাহ্যিক জীবনও নির্ভরশীল এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ভালো- মন্দও নির্ভরশীল। শারীরিক সুস্থতা আত্মার উপর নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি তো সকলেই জানে যে, আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকভাবে কাজ করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকে। আত্মা মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে কাজ আরম্ভ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার কাজ অব্যাহত থাকে। তার ছুটি নেই। তার কাজের কোনো বিরতি নেই। তার কখনো বিশ্রাম নেই। তার কাজ এই যে, সে এক মিনিটে বাহাত্তর বার পুরো দেহে রক্ত ছড়িয়ে দেয় আবার তা ফিরিয়ে নেয়। সে এ কাজ থেকে কখনোই বিশ্রাম পায় না। অন্যান্য অঙ্গের কাজের বিরতি আছে। অন্যান্য অঙ্গ বিশ্রাম করে। মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে তার চোখ বিশ্রাম করে, কান বিশ্রাম করে, দেহের অন্যান্য অঙ্গ বিশ্রাম করে, কিন্তু আত্মা ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার কাজ চালিয়ে যায়। এমনকি অচেতন অবস্থাতেও আত্মার কাজ অব্যাহত থাকে। কারণ, যেদিন আত্মা বিশ্রাম নিবে সেদিন ঐ মানুষের মৃত্যু ঘটবে। মানুষের ইহলীলা সাঙ্গ হবে।

দেহের সুস্থতা আত্মার সুস্থতার উপর নির্ভরশীল

এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আত্মা যদি সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী হয় তাহলে পুরা দেহ সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী হয়। আত্মা অসুস্থ হওয়ার চেয়ে মানুষের দেহের জন্য বড়ো কোনো বিপদ নেই।
এজন্য জনৈক কবি বলেছেন,

نیست بیماری چوں بیماری دل

'আত্মার ব্যাধির সমান কোনো ব্যাধি নেই।' এটা তো হলো আত্মার বাহ্যিক অবস্থা।

আত্মার রোগের চিকিৎসা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ শুধুমাত্র তার বাহ্যিক অবয়বের নাম নয়। বরং মানুষের আসল উপাদান হলো, তার অভ্যন্তর। যাকে ক্বলব (অন্তর) এবং রুহ (আত্মা) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়া বুখারী শরীফে বর্ণিত সহীহ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণিত করা হয় যে, মানুষের বাহ্যিক আমল বিশুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া এবং গঠন বা ধ্বংস হওয়াও এই অভ্যন্তরের গঠন ও ধ্বংসের উপর নির্ভরশীল।

একথা বলার উদ্দেশ্য যে, দেহের বহির্ভাগ যেরূপভাবে কখনো সুস্থ থাকে, আবার কখনো অসুস্থ এবং শরীরের সুস্থতা ঠিক রাখার জন্য খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি উপকরণ অবলম্বন করা হয়,

অসুস্থতা দূর করার জন্য ঔষধ-পত্র দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, তদ্রুপভাবে মানুষের অভ্যন্তর ভাগকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু উপকরণ অবলম্বন করা হয়, আর তাহলো স্বীয় খালিক (স্রষ্টা) ও মালিককে চিনা, তাঁর যিকির ও শোকর করা এবং সর্বদা তাঁর হুকুমের অনুসরণ করা। আর অভ্যন্তর ভাগের অসুস্থতা হলো, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকা এবং তাঁর হুকুমের খেলাফ (পরিপন্থী) কোন কাজ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وود

অর্থাৎ, তাদের অন্তরে (কুফর ও অবাধ্যতার) রোগ আছে, সুতরাং আল্লাহপাক তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি করেছেন। (সূরা বাকারা, ১০ আয়াত)

আধ্যাত্মিক রোগ হলো- কুফর, শিরক, মুনাফিকী, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, গর্ব, লোভ, কৃপণতা, পদের মোহ, সম্পদের মোহ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। আর সুস্থতা হলো, স্বীয় মালিক আল্লাহপাককে চেনা, সকল লাভ ও ক্ষতি, সুখ ও দুঃখের মালিক আল্লাহপাককে মনে করা, তাঁর দেওয়া নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা, যদি কোন বিপদ-আপদ আসে, তাহলে ধৈর্য ধারণ করা। সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করা এবং আযাবের ভয় করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ফিকির করা, আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে তাঁর সকল হুকুম পালন করা। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের উপকরণ হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহপাক ইরশাদ করেনঃ

دور ود وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য (রোগের) সু-চিকিৎসা এবং রহমত হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল ৮২ আঃ)

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

অর্থাৎ, (হে নবী) আপনি বলে দিন, এই কুরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়েত এবং সুচিকিৎসা। (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪৪)

শারীরিক রোগ এবং আধ্যাত্মিক রোগের আরেকটি বড় পার্থক্য এই যে, শরীরের রোগতো চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। শিরার স্পন্দন, রক্ত ও মল-মূত্রের পরীক্ষার

মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। বাহ্যিক বা শারীরিক রোগের চিকিৎসাও বিভিন্ন প্রকার অনুভবযোগ্য যন্ত্রপাতি ও ঔষধের মাধ্যমে করা হয়। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক রোগ চোখেও দেখা যায় না, শিরা ইত্যাদির স্পন্দন দ্বারাও তা বুঝা যায় না। তদ্রুপ এ রোগের চিকিৎসাও অনুভবযোগ্য খাদ্য-পথ্য ও ঔষধের মাধ্যমে হয় না। আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত নিয়মের মাধ্যমেই হতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে মানুষের বাহ্যিক আমল, লেন-দেন এবং আভ্যন্তরীণ আক্বীদা এবং আখলাক সবকিছুই সংশোধনের পরিপূর্ণ নিয়মাবলী বিদ্যমান আছে।

এ উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন হতে বর্তমান কালের কামেল বুযুর্গ পর্যন্ত, যার যা কিছু অর্জন হয়েছে, তা শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছের ঐ সকল নিয়মাবলীর উপর পরিপূর্ণ পাবন্দির সাথে আমল করার দরুণই অর্জন হয়েছে। এ সকল বুযুর্গ যেরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমলের প্রতি যথাযথ যত্নবান ছিলেন, তদ্রুপ সত্যবাদীতা, আমলী ইখলাস, বিনয়, ধৈর্য, শোকর, তাওয়াক্কুল, দুনিয়া বিমুখতা ইত্যাদি রূহানী আমলের প্রতিও যত্নবান এবং কামেল ছিলেন। তাঁরা যেমন মিথ্যা, ধোঁকা, চুরি, বেহায়াপনা ইত্যাদি গোনাহকে ভয় করতেন এবং তা থেকে বিরত থাকতেন, তদ্রুপ অহংকার ও গর্ব, অপরকে অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করা, পদের মোহ ও সম্পদের মোহ, লোভ, কৃপণতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক রোগ এবং গোনাহকেও হারাম মনে। করে তা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতেন।

উলামায়ে কিরাম সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত সকল বিধানকে কয়েকটি ইলম ও ফণরূপে (বিদ্যা ও বিষয়ে) পৃথকভাবে সংকলন করে দিয়েছেন। দৈহিক ও বাহ্যিক আমল তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক এবং সকল প্রকার লেন-দেন ও চুক্তিকে 'ইলমে ফিকাহ' রূপে। আর বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক আমলসমূহের মধ্য হতে 'আকাইদ'কে 'ইলমে আকাইদ' রূপে এবং আখলাক ও ইসলামী সামাজিক বিধি-বিধানকে 'ইলমে তাছাওউফ' রূপে সংকলিত করেছেন।

আত্মার ব্যাধি সমূহ সম্পর্কে ধারণা

জবানকে সংযত না করা

মানুষের সফলতা ও মুক্তি নিহিত আছে তিনটি জিনিসের মধ্যে:

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُقبَةَ بنِ عَامرٍ رضي الله عنه قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ:
أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ« .رواه الترمذي، وقال :حديث حسن»

.

উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, “হে আল্লাহর রসূল, কিসে মুক্তি পাওয়া সম্ভব?’

তিনি বললেন:

— জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করো।
— তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান করো।)
— আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন করো।”

তিরমিযি, তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান। রিয়াদুস সলেহিন, অধ্যায়: নিষিদ্ধ বিষয়াবলী, পরিচ্ছেদ: ২৫৪: গিবত (পরনিন্দা) নিষিদ্ধ এবং বাক সংযমের নির্দেশ ও গুরুত্ব-সহিহ।

إِنّ العَبْدَ لَيَتَكَلّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيّنُ فِيهَا، يَزِلّ بِهَا فِي النّارِ أَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ المَشْرِقِ

অর্থাৎ বান্দা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে (পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ) জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৭

বহু ক্ষেত্রে যবানের অপব্যবহার গভীর সম্পর্ককেও তছনছ করে দেয়। নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝেও ফাটল ধরায়। দীর্ঘদিনের আত্মীয়তাকে মুহূর্তে শেষ করে দেয়। হৃদয়কে জর্জরিত করে। অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করে, যা কখনও মানুষ ভুলতে পারে না। কারণ, যবানের আঘাতের ঘা শুকায় না। কবি বলেছেন-

جراحات السنان لها التيام +ولا يلتام ما جرح اللسان

বর্শার ফলার আঘাতের উপশম হয়। তবে যবানের আঘাতের কোনো উপশম নেই।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ ... :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيّ؟ قَالَ :فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمّ قَالَ " :هَذَا ".

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আসসাকাফী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমার কোন্ বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি আশংকা করেন। তখন তিনি নিজ জিহ্বা ধরলেন এরপর বললেন, এটা। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৪১৯

সাধারণত আমাদের কথা চার ধরনের হয়।

১. পুরো কথাই কল্যাণকর।

২. পুরো কথাই ক্ষতিকর।

৩. যে কথাতে কল্যাণ-অকল্যাণ মিশ্রিত থাকে।

৪. যে কথাতে দুনিয়া-আখেরাতের লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই। অর্থাৎ অনর্থক কথা।

কল্যাণকর কথার ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান হল পুরোপুরি জেনেশুনে কথা বলা। অনুমান করে কথাবার্তা বলবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا .

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। জেনে রেখো, কান, চোখ হৃদয়- এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৬

আমাদের অনেকের মাঝেই একটি প্রবণতা খুব লক্ষ করা যায়। আমরা যা শুনি তাই বিশ্বাস করি এবং প্রচার করতে শুরু করি। যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন বোধ করি না। কোনো তথ্য বা সংবাদ বর্ণনা করার আগে যাচাই-বাছাই করা কর্তব্য। অন্যথায় মিথ্যা হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

ব্যক্তি যা শুনে তা বর্ণনা করা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪

যাচাই-বাছাই ছাড়া কথা বলতে থাকা কিংবা সে অনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণ করতে থাকা চরম বোকামী। পরিণামে তা আক্ষেপের কারণ হয় এবং ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে। মহান আল্লাহ বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

হে মুমিনগণ! কোনো ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়। -সূরা হুজুরাত (৪৯) : ৬

যে কথায় কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টাই রয়েছে, বিশেষ প্রয়োজনে তা বলা যাবে। যেমন, বললে কারো গীবত হয়, না বললে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়- এমন কথা।

ক্ষতিকর ও অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। মুমিন তো ক্ষতিকর কথা বলতেই পারে না। এসব বলে মুমিন কেন জাহান্নামে যাবে? মুমিন তো অনর্থক কথা থেকেও বেঁচে থাকে। এজন্যে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। -সূরা মুমিনূন (২৩) : ৩

বিজ্ঞজনের উক্তি-

في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت...

‘যবানের দুটি বিপদ। কথার বিপদ ও চুপ থাকার বিপদ! একটি থেকে মুক্তি পেলেও অপরটি থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।’

কখনো একটি আরেকটির চেয়ে বড় বিপদ হয়ে সামনে আসে। সত্য থেকে যে চুপ থাকে সেও তো অপরাধী। আর যে বাতিল কথা বলে সে আল্লাহর অবাধ্য, শয়তানের মুখপাত্র।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবান হেফাযতের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন-

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে তার যবান ও লজ্জাস্থান হেফাযতের যামানত দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

হাদীসে এসেছে-

كَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضِّحْكِ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘসময় চুপ থাকতেন এবং কম হাসতেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৮১০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، ثُمَّ يَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ وَيْلٌ لَهُ .وَوَيْلٌ لَهُ.

ধ্বংস ওর! যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। ধ্বংস ওর! ধ্বংস ওর জন্য!! -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০০২১।

ঝগড়া-ফাসাদ

কারোর সাথে কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্। তা এভাবে যে, কোন সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নেই বরং অন্যকে অপমান করা এবং নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই কারোর কথায় দোষ-ত্রুটি বের করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে এ জাতীয় লোকদের লুক্কায়িত উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، إِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ، مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ»

‘‘নিশ্চয়ই যারা কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ্ তা‘আলার নিদর্শনসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহঙ্কার যা সফল হবার নয়। অতএব তুমি আল্লাহ্ তা‘আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা’’। (গাফির/মু’মিন : ৫৬)

কারোর সাথে তর্ক করলে তা একমাত্র সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এবং সুন্দর পন্থায় হতে হবে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

«وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ»

‘‘তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে একমাত্র উত্তম পন্থায়ই তর্কে লিপ্ত হবে’’। (‘আন্কাবূত : ৪৬)

কারোর সাথে অনর্থক ঝগড়া-ফাসাদকারী আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট একেবারেই ঘৃণিত এবং তারাই তাঁর কোপানলে পতিত।

‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْـخَصْمُ.

’’নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদকারীই’’। (বুখারী ২৪৫৭, ৪৫২৩; মুসলিম ২৬৬৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ؛ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ.

‘‘যে ব্যক্তি জেনেশুনে কারোর সাথে বাতিল কোন জিনিস নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করলো আল্লাহ্ তা‘আলা সত্যিই তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়’’। (আবূ দাউদ্, হাদীস ৩৫৯৭; আহমাদ ৫৩৮৫)

কুর‘আন নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরি।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْـمِرَاءُ فِيْ الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

‘‘কুর‘আন নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরি’’।

(আবূ দাউদ্, হাদীস ৪৬০৩; আহমাদ ৭৮৪৮ ইব্নু হিববান/মাওয়ারিদ্, হাদীস ৫৯ ’হাকিম ২/২২৩)

কোন ব্যক্তি হিদায়াতের রাস্তা থেকে ফসকে গেলেই অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়।

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوْتُوْا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ: (مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ)

‘‘কোন জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর আবারো পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে (আল্লাহ্ তা‘আলা) তাদেরকে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে ব্যস্ত করে দেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন: যার মর্মার্থ: তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এমন কথা বললো। বস্তুত তারা বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়’’। [যুখরুফ : ৫৮ (তিরমিযী ৩২৫৩; আহমাদ ৫/২৫২-২৫৬; ইব্নু মাজাহ্ ৪৮ ’হাকিম ২/৪৪৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের মধ্যে এ জাতীয় বাকপটু মুনাফিকের আশঙ্কাই করেছিলেন।

’ইমরান বিন্ ’হুস্বাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

“আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে প্রত্যেক বাকপটু মুনাফিকেরই বেশি আশঙ্কা করছি”। (ত্বাবারানী/কবীর খন্ড ১৮ হাদীস ৫৯৩; ইব্নু হিববান ৮০ বায্যার, হাদীস ১৭০)

মিথ্যা বলা

মিথ্যা একটি গুরুতর পাপ। জঘন্য অপরাধ। কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন জায়গায় এর নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাতের কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

তোমার কাছে ইলম আসার পর যে কেউ তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করে, তাকে বলে দাও, এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের স্ত্রীগণকে ও তোমাদের স্ত্রীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে অতঃপর আমরা মুবাহালা (তথা বিনীত নিবেদন) করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর অভিসম্পাত পাঠাই। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৬১

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ، وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

যারা নিজের স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয়, আর নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী না থাকে, এমন কোনো ব্যক্তিকে যে সাক্ষ্য দিতে হবে তা এই যে, সে চারবার আল্লাহর কসম করে বলবে, (স্ত্রীকে দেওয়া অভিযোগের ক্ষেত্রে) অবশ্যই সে সত্যবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে। -সূরা নূর (২৪) : ৬-৭

এসব আয়াত থেকে বোঝা যায়, যে মিথ্যা বলে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। সে আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। পরিণামে তা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

মিথ্যার ভয়াবহতা এত বেশি যে, আল্লাহ তাআলা মূর্তিপূজা বর্জন করার আলোচনা যেখানে করেছেন সেখানে তার সঙ্গে মিথ্যা কথা বর্জন করার কথাও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ.

তাই তোমরা প্রতিমাদের নাপাকি ও মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাক। -সূরা হজ¦ (২২) : ৩০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদীস শরীফে মিথ্যার ভয়াবহতা ও তার কদর্যতা তুলে ধরেছেন।

হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَإِيّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النّارِ، وَمَا يَزَالُ الرّجُلُ... يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذّابًا.

সাবধান! মিথ্যা কথা পরিহার কর। নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬০৭

রোযা আল্লাহ তাআলার অনেক পছন্দনীয় আমল। রোযাদার আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তা সত্ত্বেও যে রোযাদারের মিথ্যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে তাকে আল্লাহ ভালবাসেন না। তার রোযা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা অনুযায়ী চলা ও অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ ছাড়ল না তার পানাহার বর্জনের আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৩

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলাকে মুনাফিকের আলামত আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

أَرْبَعٌ مَن كُنّ فيه كانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَن كَانَتْ فيه خَلّةٌ منهنّ كَانَتْ فيه خَلّةٌ مِن نِفَاقٍ حتّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدّثَ كَذَبَ، وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

চারটি দোষ কারও মাঝে থাকলে সে নিরেট মুনাফিক হয়ে যায়। তার কোনো একটি থাকলে তার মাঝে একটি মুনাফিকীর চরিত্র থাকল; যতক্ষণ না তা থেকে মুক্ত হয়।

এক. কথা বললে মিথ্যা বলে।

দুই. চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তা লঙ্ঘন করে।

তিন. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে।

চার. ঝগড়ায় লিপ্ত হলে বাজে কথা বলে (গালিগালাজ করে)। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে মিথ্যার এক ভয়াবহ শাস্তি দেখানো হয়েছে। যা নিচের হাদীসে বিবৃত হয়েছে। আর একথা সর্বস্বীকৃত যে, নবীদের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। তিনি ইরশাদ করেন-

إِنّهُ أَتَانِي اللّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ...فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ...قَالَ :ثُمّ يَتَحَوّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتّى يَصِحّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرّةَ الأُولَى قَالَ " :قُلْتُ :سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ ...قَالاَ لِي :أَمَا إِنّا سَنُخْبِرُكَ ...وَأَمّا الرّجُلُ الّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنّهُ الرّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ.

আজ রাতে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এসে আমাকে ঘুম থেকে উঠাল। তারা আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলল। ...আমরা এক ব্যক্তির কাছে এলাম যে চিত হয়ে শোয়া ছিল। আরেক ব্যক্তি তার পাশে লোহার এক কাঁচি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঐ ব্যক্তির এক পাশে এসে তার চোয়াল ঘাড় পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেলছে। নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেলছে। এরপর চোয়ালের অপর পাশে অনুরূপ করতে থাকে। এক পাশ ফাঁড়তে ফাঁড়তে অপর পাশ ঠিক হয়ে যায়। আবার অপর পাশ আগের মত ফাড়তে থাকে। ...রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, এরা কারা? ...তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জানাবো। ...যে ব্যক্তির কাছে আপনি গিয়েছিলেন, যার চোয়াল ঘাড় পর্যন্ত এবং নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত ফেড়ে ফেলা হচ্ছিল সেই ব্যক্তির অভ্যাস ছিল, ঘর থেকে বের হলেই মিথ্যা বলত। ফলে সে মিথ্যা দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত। (যে মিথ্যার আর প্রতিকার সম্ভব ছিল না।) -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৪৭

উপরিউক্ত হাদীস থেকে মিথ্যার ভয়াবহতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। মিথ্যা কত বড় গুনাহ হলে এমন ভয়াবহ শাস্তি হতে পারে।

মিথ্যা বলা এতটাই জঘন্য অপরাধ যে, দুষ্টুমি করে বললেও গুনাহ। হাদীস শরীফে এ ধরনের ব্যক্তির জন্য ধ্বংসের বদদুআ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

.ويلٌ للّذي يحدِّثُ فيَكذِبُ ليُضحِكَ بِه القومَ، ويلٌ لَه، ويلٌ لَهُ

যে ব্যক্তি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলে, ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯০

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিথ্যার যাবতীয় ব্যবহার থেকে রক্ষা করুন।

বিদ্বেষ

হিংসার পথ ধরেই আমাদের মনে আরেকটি রোগ জন্ম নেয়। একে আমরা বিদ্বেষ বলি। এমনিতেও শব্দ দুটি একে অন্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। হিংসা যেমন চুলার আগুনের মতোই আমাদের নেক আমলগুলো পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, বিদ্বেষও তেমনি আড়াল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নেক আমলের সামনে। হাদীস শরীফে বিদ্বেষ পোষণকারীদের জন্যে সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন উপস্থাপনায়। বিদ্বেষের ভয়াবহতা আমরা একটি হাদীস থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

.إِنّ اللهَ لَيَطّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

অর্থ: শাবানের রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারীকে ক্ষমা করেন না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৯০।

এই হাদীসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় :

এক. আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তাঁর সকল সৃষ্টিই যখন সেই ক্ষমা লাভে ধন্য হয়, তখনো বিদ্বেষপোষণকারী কেউ এ ক্ষমা পাবে না।

দুই. বিদ্বেষপোষণকারীকে এ হাদীসে মুশরিকের সহযাত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিককে যেমন ওই রাতে ক্ষমা করা হয় না, তেমনি বিদ্বেষপোষণকারীকেও ক্ষমা করা হয় না। মুশরিক তো সে-ই, যে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক করে। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ। শিরক করার পর তওবা না করে যে মারা যাবে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা খুবই স্পষ্ট-

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যদি কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাহলে সে তো এক মহাপাপে জড়িয়ে পড়ল। -সূরা নিসা (৪) : ৪৮

এই হচ্ছে শিরক আর মুশরিকের পরিচয়। এ মুশরিকের সঙ্গে যখন কাউকে জুড়ে দেয়া হয় তখন তার হতভাগ্য আর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন থাকে না। একদিকে সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত, অপরদিকে মুশরিকের সহযাত্রী। বিদ্বেষকারীর গন্তব্য তাহলে কোথায়! মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে-

يَطّلِعُ اللّٰهُ عَزّ وَجَلّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لاِثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ.

অর্থ: শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টির দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকান। তখন তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তবে দুইজনকে নয়-বিদ্বেষ পোষণকারী আর মানুষ হত্যাকারী। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬৪২

এই হাদীসে বিদ্বেষপোষণকারীর সঙ্গী মানুষ হত্যাকারী। অন্যায়ভাবে কেউ যখন কাউকে হত্যা করে সেটা তো কুরআনের ভাষায় সকল মানুষকে হত্যার সমান অপরাধ!
কুরআনের ভাষায়-

كَتَبْنَا عَلٰى بَنِیْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

আমি বনী ইসরাইলকে এ বিধান দিয়েছিলাম, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, প্রাণের বিনিময় কিংবা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়ানোর অপরাধে নয়, তাহলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। -সূরা মায়িদা (৫) : ৩২

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার মানুষের আমল (আল্লাহ তাআলার সামনে) পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ এমন সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন, যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না। তবে এমন দুজনকে তিনি ক্ষমা করেন না, যাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়-তাদের দুজনকে দেখো, তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায় কি না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫

বিদ্বেষ বান্দার আমল কবুল হওয়ার পথে এক শক্ত দেয়াল। প্রতি সপ্তাহে দুদিন যখন বান্দার যাবতীয় আমল আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় সাধারণ ক্ষমা, তখনো বিদ্বেষপোষণকারীরা বঞ্চিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। যখন কেউ আল্লাহ তাআলার কোনো অধিকার লঙ্ঘন করত, আল্লাহ তাআলা যা কিছু সম্মানিত করেছেন সেই সম্মান যখন কেউ ক্ষুন্ন: করত তখনই কেবল তিনি প্রতিশোধ নিতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৭৮৬।

অহংকার

এক আরবী গল্পে অহংকারের উপমা খুব চমৎকার ফুটে উঠেছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কেউ যখন নিচে তাকায়, তখন সবকিছুই তার কাছে ছোট ছোট মনে হয়। নিজের দুই চোখ দিয়ে হাজারো মানুষকে সে ছোট করে দেখে। আবার যারা নিচে আছে তারাও তাকে ছোটই দেখে। তবে দুই চোখের পরিবর্তে এক হাজার মানুষের দুই হাজার চোখ তাকে ছোট করে দেখছে। অর্থাৎ অহংকার করে একজন যখন সবাইকে তুচ্ছ মনে করে তখন এ অহংকারীকেও অন্য সবাই তুচ্ছ মনে করে।

এই অহংকার হচ্ছে সকল পাপের মূল। একে আরবীতে বলা হয় 'উম্মুল আমরায-সকল রোগের জননী'। বরং বলা যায়, এ জগতের প্রথম পাপই হচ্ছে অহংকার। সৃষ্টিজগতের প্রথম মানব আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের আদেশ করেছিলেন-তোমরা আদমকে সিজদা কর। এই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তাআলা যখন ফেরেশতাদেরকে তাঁর মানব-সৃষ্টির ইচ্ছার কথা

জানিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল-আপনি আমাদেরকে রেখে এমন কোনো জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা নৈরাজ্য ঘটাবে, একে অন্যের রক্ত ঝরাবে, অথচ আমরা তো আপনার সার্বক্ষণিক ইবাদতে মগ্ন! মনে মনে তারা এও ভেবেছিল-আল্লাহ তাআলা কিছুতেই এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন না, যে আমাদের চেয়ে বেশি জানে এবং তাঁর নিকট আমাদের তুলনায় অধিক সম্মানিত হবে। এসবের পরও ফেরেশতাদেরকে যখন আল্লাহ বললেন, তোমরা আদমকে সিজদা কর, সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। এই তো ফেরেশতাদের পরিচয়-তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা-ই করে। কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে বেড়ে ওঠা শয়তান মাটি আর আগুনের যুক্তি হাজির করল। সে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল। পাক কুরআনের ভাষায়-

اَبٰی وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ.

সে অস্বীকৃতি জানাল এবং অহংকার করল। আর সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা বাকারা (২) : ৩৪

এই হল প্রথম অহংকারের ইতিহাস। কুরআনে কারীমে বর্ণিত প্রথম পাপের বিবরণ। এ পাপের দরুণ শয়তান অভিশপ্ত হল, জান্নাত থেকে বিতাড়িত হল, মানুষের শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে পৃথিবীতে এল। কত শক্ত শপথ সেদিন সে করেছিল-

قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَیْتَنِیْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیْمَ ثُمَّ لَاٰتِیَنَّهُمْ مِّنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَیْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآىِٕلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِیْنَ.

সে বলল, আপনি যেহেতু আমাকে পথচ্যুত করেছেন তাই আমি অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। -সূরা আ'রাফ (৭) : ১৬-১৭

এই যে শয়তানের শপথ এবং এ শপথের শক্তিতে সে বিভ্রান্ত ও পথহারা করে যাচ্ছে বনী আদমকে, এর মূলে তো সেই অহংকার। অহংকার তাই বিবেচিত হয় সবচেয়ে ভয়ংকর আত্মিক রোগ হিসেবে।

বর্তমান সময়ের একটি ভয়ংকর রোগ হচ্ছে ক্যান্সার। এ রোগ কিছুদিন মানুষের শরীরে লুকিয়ে থেকে একসময় প্রকাশ পায়। রোগ প্রকাশ পাওয়া, রোগীর শরীরে বিভিন্ন আলামত ফুটে ওঠাও

এক প্রকার নিআমত। কারণ এর মাধ্যমেই রোগীর চিকিৎসার পথ উন্মোচিত হয়। কিন্তু অহংকার রোগটি এমন, মানুষ মনেই করে না-তার মধ্যে অহংকার আছে। রোগের অনুভূতিই যখন না থাকে তখন এর চিকিৎসার কথা ভাববে কে?

অহংকার কী-এ প্রশ্নের সরল উত্তর হচ্ছে, কোনো বিষয়ে নিজেকে বড় মনে করে অন্য মানুষকে তুচ্ছ মনে করার নামই অহংকার। শক্তিতে, সামর্থ্যে, বয়সে, অভিজ্ঞতায় ত্রিশ বছরের যুবক যতটা সমৃদ্ধ, বার বছরের একটি ছেলে তো সবক্ষেত্রেই তার তুলনায় হবে রিক্তহস্ত। তার ছোট হওয়া এবং তাকে ছোট মনে করা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। বাস্তবেই যে ছোট তাকে ছোট মনে করা অহংকার নয়। বরং অহংকার হচ্ছে, সে ছোট বলে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। কাড়ি কাড়ি টাকা যার ব্যাংক একাউন্টে সঞ্চিত, সে তো যে দিন এনে দিন খায় তাকে অর্থবিত্তে ছোট মনে করতেই পারে। এটা অহংকার নয়। অহংকার হচ্ছে তাকে তাচ্ছিল্য করা, গরীব বলে তাকে হেয় করা।

এ অহংকার একটি ঘাতক ব্যাধি। পবিত্র কুরআনে নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে এই ঘাতক ব্যাধির কথা। ঘাতক ব্যাধি বললাম, কারণ তা মানুষের অন্তর্জগৎকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়। আর এর পরকালীন ক্ষতি তো রয়েছেই। যে অহংকার শয়তানকে 'শয়তানে' পরিণত করেছে, অভিশপ্ত করে দিয়েছে, রহমতবঞ্চিত করেছে, সে অহংকারের মন্দ দিক সম্পর্কে আর কিছু না বললেও চলে। এরপরও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِیَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব। -সূরা আ'রাফ (৭) : ১৪৬

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ لَا جَرَمَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে লিপ্ত। স্পষ্ট কথা, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ জানেন এবং যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। -সূরা নাহল (১৬) : ২২-২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ.

তিল পরিমাণ অহংকার যার অন্তরে আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর তিল পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে আছে সে দোজখে যাবে না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৯৮।

লোভ

وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে তার চাইতেও ধনলোভ ও খ্যাতিলোভ মানুষের দ্বীনের অধিক বিনাশ সাধন করে।

(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২১৮, সহীহুল জামে' ৫৬২০)

কৃপণতা

الَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ وَ يَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبُخۡلِ وَ يَكۡتُمُوۡنَ مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَذَابًا مُّهِيۡنًا ﴿٣٧﴾

যারা কৃপণতা করে এবং লোককে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাদেরকে যা দান করেছেন তা গোপন করে, (আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না।) আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

সূরা আন নিসা- ৩৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! সৎপথে ব্যয়কারীদেরকে শুভ প্রতিদান দান করুন। আর অন্যজন বলেন হে আল্লাহ! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দিন। [বুখারী ১৪৪২]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক, কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এ কৃপণতাই ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের কার্পণ্য নির্দেশ দিয়েছে কৃপণতা করার, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, অনুরূপভাবে তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা তা ছিন্ন করেছে এবং তাদেরকে অশ্লীলতার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা অশ্লীল কাজ করেছে। [আবু দাউদঃ ১৬৯৮]।

ক্রোধ/রাগ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একজন সাহাবীকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ‘তুমি রাগ করিও না’ একথা তিনি তিনবার বলেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে যখন এক লোক রাগান্বিত হয়েছিল তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে আদেশ করেছিলেন।

“এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, হে আমার প্রতিপালক! যাতে শয়তানরা আমার নিকট হাজির হতে না পারে।" (২৩-সূরা আল মু'মিনূনঃ আয়াত-৯৮)

“নিশ্চয় যারা মুত্তাকী, তাদেরকে যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের অন্তদৃষ্টি খুলে যায়।” (৭-সূরা আল আরাফঃ আয়াত-২০১)

যা মানুষকে হতাশ ও বিষন্ন করে ক্রোধও তার মধ্যে একটি। নিচে রাগ দমন করার কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

১. রাগকে আপনার শত্রু মনে করে তা দমন করার জন্য প্রতিযোগিতা করুন।

“এবং ক্রোধ সংবরণকারীগণ এবং মানুষদেরকে ক্ষমাকারীগণ, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।” (৩-সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত-১৩৪)

“আর যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।” (৪২-সূরা আশ শূরাঃ আয়াত-৩৭)

“আর যখন মূসার রাগ পড়ল তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন।” (৭-সূরা আল আরাফঃ আয়াত-১৫৪)

২. অযু করুন, কেননা ক্রোধ আগুনের একটি কণা, এটাকে পানি দ্বারা নিভানো যায়।

৩ আপনি দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়ুন আর বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়ুন।

৪. ক্রুদ্ধ অবস্থায় চুপ থাকুন।

৫. যারা রাগ দমন করে ও যারা ক্ষমা করে তাদের পুরস্কারের কথা স্মরণ করুন।

আত্মার ব্যাধিসমূহ হতে সুস্থতার জন্য পদক্ষেপ:

আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ : তাওবা

صد بار اگر توبه شکستی باز آ

অর্থাৎ, শতবার যদি তাওবা ভঙ্গ করে থাকো, তবুও ফিরে এসো।

কোন লোক যদি চায় যে, তার আভ্যন্তরীণ জগত সুস্থ হোক এবং তার সকল আধ্যাত্মিক রোগ দূর হয়ে যাক, সে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করে দোযখের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করুক, তাহলে এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো তাওবা।

সাধারণভাবে লোকেরা তাওবা বলতে একথা বুঝে যে, এটি কেবলমাত্র মুখের সাথে যুক্ত। একটা মারাত্মক ধরনের ভুল ধারণা। কারণ তাওবার প্রকৃত অর্থ হলো, বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। যতটুকু সম্ভব তার ক্ষতিপূরণ করা এবং ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় পণ করা।

ইমাম গাযালী (রহঃ) এ কথাটি খুবই সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেনঃ এ দুনিয়ায় ভাল-মন্দ মিলে-মিশে থাকে। ঐ সকল জিনিসের মধ্যে তাকওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার উপকরণ যেমন আছে, তেমনি পাপ-পঙ্কিলতার প্রতি আকর্ষণ করার উপকরণও আছে। অনেক জিনিস এমন আছে, যা আপনাকে নেক ও ছওয়াবের কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর অনেক জিনিস এমন আছে যা আপনাকে গোনাহের কাজের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব হলো, গোনাহের চাহিদাকে পরাজিত করে নেক কাজের আগ্রহকে বিজয়ী করা। তিনি আরো বলেন, এর দৃষ্টান্ত হলো ঐ স্বর্ণ যার মধ্যে 'খাদ' মিলানো আছে। এ

স্বর্ণকে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করতে হলে এ স্বর্ণ থেকে খাদকে পৃথক করতে হবে। আর এজন্য একমাত্র উপায় হলো, আগুনে তাপ দিয়ে এই স্বর্ণকে গলানো। আগুনের তাপে স্বর্ণকে গলানো হলেই খাদ মুক্ত করা যাবে। অন্যথায় নয়। ঠিক এরূপভাবেই মানুষের নেকীকে বদী থেকে পৃথক করার জন্য তাপের প্রয়োজন হয়। এই তাপ যা মানুষকে ভেজালমুক্ত করে, তা দুই প্রকার। একটি হলো দোযখের আগুনের তাপ। কারণ মুমিন ব্যক্তিকে যদি জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হয়, তাহলে তা কেবল তাকে পাপ-পঙ্কিলতার ভেজাল মুক্ত করার জন্যই হবে। শুধু শাস্তির জন্য নয়। বরং এভাবে পাক-সাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করানোই উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং জ্বালানোর উদ্দেশ্যেই স্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُور ،

অর্থাৎ, আমি কাফের ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (সূরা সাবা ১৭)
অপরটি হলো, আফসোস ও অনুশোচনার তাপ। এটা এমন তাপ যা এ দুনিয়াতেই ভেজালকে গলিয়ে খাঁটি জিনিষ হতে পৃথক করে থাকে।
ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেনঃ মানুষকে ভেজালমুক্ত হওয়ার জন্য এই দুই প্রকার তাপ হতে কোন না কোন প্রকার তাপে অবশ্যই দগ্ধ হতে হবে। এখন (তার ইচ্ছা) সে যদি চায় তাহলে নিজের জন্য জাহান্নামের আগুনকে অবলম্বন করতে পারে। আর যদি এটা তার কাছে কষ্টকর মনেহয়, (যা আসলেও অনেক কষ্টকর) তাহলে তার জন্য এ দুনিয়াতেই নিজ অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই আফসোস, অনুতাপ ও অনুশোচনার নামই 'তাওবা'। এজন্য হাদীছ শরীফে বলা হয়েছেঃ

الندم توبة অর্থাৎ অনুশোচনাকেই তাওবা বলে।

(মুসনাদে আহমাদ ১৯৬২১, ইবনে মাজাহ ৩১৩)

তাওবার তিনটি উপকরণ

এখন প্রশ্ন হলো, এই অনুশোচনা কিভাবে পয়দা হবে। এর উত্তর এই হবে যে, অনুশোচনা পয়দা করার একমাত্র উপায় হলো, ইলম।

আত্মশুদ্ধির পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ ধৈর্য

মাকামে সবর বা ধৈর্য ও তার প্রকারভেদ

আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাওবার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জাহের ও বাতেন (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরাণ) যিন্দেগীকে সংশোধন করার জন্য ফিকির করবে। এর অর্থ এই যে, আল্লাহপাক যে সকল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে এবং যে সকল জিনিস নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। শারীরিক বা দৈহিক জীবনের মত আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আমল এমন আছে যেগুলো আমাদেরকে করতে বলা হয়েছে। এসকল জিনিসকে তাছাওউফের পরিভাষায় فضائل বলা হয়। আর কিছু বিষয় এমন আছে যেগুলো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সে সকল বিষয়কে তাছাওউফের পরিভাষায় رذائل বলে।

صبر সবর এর শাব্দিক অর্থ হলো, বাধা দেওয়া। আর ইসলামী পরিভাষায় সবর বলা হয়, নিজে নিজেকে নাজায়েয খেয়াল-খুশি থেকে বিরত রাখা।

এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যে, কুরআনে কারীম এবং ইসলামী পরিভাষায় সবর শব্দটির অর্থ কেবল এ নয় যে, কোন দুঃখ-কষ্টের সময় হা-হুতাশ না করা যেমন সাধারণ আলোচনায় সবর صبر শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। বরং তার ইসলামী পারিভাষিক অর্থের গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং ব্যাপক। এ অর্থে দ্বীনের প্রায় সকল শাখা সবরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে পবিত্র কুরআনে مقام صبر হাসিল করার জন্য যেরূপ তাকিদ করা হয়েছে, সম্ভবতঃ অন্য কোন বিষয়ে এরূপ তাকীদ করা হয় নাই। সাথে সাথে صبر এর বিনিময় এবং ছওয়াবও এত বেশী বলা হয়েছে, যা অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। সুতরাং কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে সত্য এবং ধৈর্যের উপদেশ দাও।

(সূরা আসর ২-৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

. حِسَابِ ورت و در إنما يوفى يوفى الصابرون أجرهم بغير

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে।

(সূরা যুমার ১০)

ধৈর্যের উপরোক্ত গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন।

এটাতো সকলেই জানে যে, আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ের উপাদান রেখেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

অর্থাৎ, আল্লাহপাক মানুষের হৃদয়কে গোনাহ এবং তাকওয়া উভয় সম্পর্কে অবগত করেছেন। (সূরা আশ শামছ ৮)

আর দুনিয়াতে আল্লাহপাক মানুষকে যে পরীক্ষা করেন, এর উদ্দেশ্যও এটাই যে, মানুষ মন্দ (পাপ) জিনিসকে ত্যাগ করে উত্তম (ছওয়াব) জিনিস অবলম্বন করবে। এ উদ্দেশ্যে মানুষের অভ্যন্তরস্ত ভাল উপাদানকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু উপকরণ নির্ধারণ করেছেন। সাথে সাথে মন্দ উপাদানকে শক্তিশালী করার জন্যও কিছু উপকরণ আছে।

মানুষকে ভাল জিনিসের (ছওয়াবের কাজের) প্রতি উৎসাহিত করার জন্য একটি শক্তি মানুষের অন্তরেই রাখা হয়েছে। যাকে نفس لوامه

বলা হয় এবং সাধারণের পরিভাষায় এটাকে (ضمير বা বিবেক) বলে। কোন মানুষ যখন কোন পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন একটি অদৃশ্য শক্তি তাকে সেই পাপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এটাই نفس لوامه যাকে আমরা বিবেক বলে আখ্যায়িত করে থাকি। এছাড়া আরো কিছু বহির্গত শক্তি এমন আছে, যা মানুষকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বহির্গত শক্তি হলো, ফেরেশতা। ফেরেশতা আল্লাহপাকের আনুগত্যশীল মাখলুক। এদের মধ্যে খারাপ কাজের কোন উপাদানই সৃষ্টি করা হয়নি।

পক্ষান্তরে দু'টি শক্তি এমন আছে, যা মানুষকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। তার মধ্যে একটি মানুষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে, যাকে نفس اماره বলা হয়। এটাই নফসানী খাহেশাত তথা প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি বা কামনা-বাসনার এমন উৎসস্থল, যা নেক কাজে ফাঁকি দেওয়ার এবং গোনাহের কাজের প্রতি আকৃষ্ট করার জযবা পয়দা করে থাকে। আর পাপের প্রতি

উৎসাহিত করার দ্বিতীয় শক্তি হলো শয়তান। সে তার জীবনের উদ্দেশ্যই বানিয়েছে মানুষকে নেক কাজ থেকে দূরে রেখে গোনাহের কাজে লিপ্ত করে দেওয়াকে।

এই দুই ধরনের শক্তির টানাটানির মধ্যেই মানুষের জন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য জরুরী হলো, মানুষ গোনাহের চাহিদার উপর নেক কাজের আগ্রহকে প্রাধান্য দিবে, বিজয়ী করবে। এটাকেই শরীঅতের পরিভাষায় صبر বা ধৈর্য বলে।

কেবলমাত্র মৌখিক জমা-খরচ দ্বারা ধৈর্যের এই সুউচ্চ মাকাম হাসিল করা যাবে না। এজন্য কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। সুফিয়ায়ে কেরাম অধিকাংশ মুজাহাদা (সাধনা) কে নির্দিষ্ট করেছেন এই ধৈর্যের মাকাম অর্জন করার জন্যই। অনেক বুযুর্গানেদ্বীন সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা অনেক বৈধ জিনিসও ত্যাগ করেছিলেন। এটা এজন্য নয় যে, তারা এ সকল বৈধ জিনিসকে হারাম মনে করতেন। বরং প্রকৃত অবস্থা হলো, তারা নফসানী খাহেশাতকে (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনা তথা রিপুকে) নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করতেন।

প্রথম দিকে মানুষের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়। কিন্তু একবার যদি কষ্ট করে এই তিক্ত ঔষধ খেয়ে নেয়, তাহলে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এ কাজ আল্লাহপাক তার জন্য সহজ করে দেন। এভাবে তার নফস نفس مطمئنه (প্রশান্ত হৃদয়) হয়ে যায়। অর্থাৎ তার নফসের উত্তম কাজের চাহিদা এমন প্রবল হয়ে যায় যে, পাপ ও খারাপ কাজের চাহিদা তার নিকট একেবারে দুর্বল এবং মৃতপ্রায় হয়ে যায়। এ কথাটিকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেনঃ

من يتصبر يصبره الله

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধৈর্যের মাকাম পর্যন্ত পৌছতে চায়, আল্লাহপাক তাকে صبر এর মাকাম দান করেন।

(বুখারী শরীফ ১৪১৯৮, মুসলিম শরীফ ১৪৩৩৭)

আর যে ব্যক্তি এই মহান নিয়ামত লাভ করে, তার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

ما اعطى احد عطاء خيرا و اوسع من الصبر

অর্থাৎ, ধৈর্যের চেয়ে উত্তম এবং প্রশস্ত কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। (সহীহ বুখারী ১ঃ১৯৮, তিরমিযী ২ঃ২২)

ধৈর্যের এই (উচ্চ) মাকাম হাসিল করার আসল তরীকা হলো, সবর বা ধৈর্যের এই মাকাম যে সকল বুযুর্গদের নসীব হয়েছে, তাদের সোহবত বা সংসর্গ অবলম্বন করা। অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, পরিবেশ এবং নেক সোহবতের চেয়ে বড় শিক্ষক মানুষের জন্য আর কিছুই নেই। মানুষ যদি ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এবং পরিবেশে থাকে, তাহলে সেও ধীরে ধীরে ধৈর্যশীল হয়ে যাবে।

এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সবরের (বা ধৈর্যের) মাকাম হাসিল করার পদ্ধতি হলো, যখন অন্তরে কোন পাপের খেয়াল আসবে, তখনই পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে এই গোনাহর প্রতি যে সতর্কবাণী ও মারাত্মক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কল্পনা করবে এবং সাথে সাথে স্বীয় মৃত্যু, পরিণতি ও কবরের একাকিত্ব ও নির্জনতার কথা স্মরণ করবে। এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর চিন্তার প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেনঃ

اكثروا ذكرها اذم اللذات الموت

অর্থ, সকল স্বাদ বিনাশকারী অর্থাৎ মউতকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

(তিরমিযী ২ঃ৭৫, নাসায়ী ১ঃ২০২)

যে সকল লোককে আল্লাহপাক ধৈর্যের নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন এবং যাদের নেক কাজ করার শক্তি পাপ কাজের শক্তির চেয়ে প্রবল, তাদেরও কোন সময় নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।

মুজাহাদা বা সাধনা

বিগত এক আলোচনায় বলা হয়েছিলো যে, মানুষের অন্তরে যে সকল কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়, তা দুই প্রকার। (১) হুকূকে নফস এবং (২) হুযূযে নফস।

হুকূকে নফস ঐ সকল জিনিসকে বলে, যে সকল জিনিসের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। যেমন, পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, জান্নাত হওয়া, চলা-ফেরা এবং প্রয়োজন অনুসারে বৈধভাবে যৌন চাহিদা মিটানো। এসবই হুকুকে নফসের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল চাহিদা পূরণ করা শুধু

জায়েযই নয়, বরং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ফরয এবং ওয়াজিরও হয়ে থাকে। এ সকল হুকুক পূর্ণ না করা বৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।

হুযুযে নফস- নফসের এমন সম্ভোগকে (চাহিদাকে) বলা হয়, যা মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত। তাছাওউফের পরিভাষায় نفس كشى (রিপু দমন) এবং مخالفت نفس (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধাচারণ) বলতে এ সকল কামনা-বাসনা ও সম্ভোগ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, মানুষ যেন অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। এ বিষয়ের প্রতিই পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছেঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা আন-নাযিআত ৪০-৪১)

কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় هوى শব্দটি هدى শব্দের বিপরীতে ব্যবহার হয়, আর এ هوى শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, যা হযুযে নফসের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই رياضت و مجاهدات তথা কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।
মুজাহাদা বা সাধনার অর্থ হলো, নাজায়েয এবং গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু কিছু জায়েয কাজ ত্যাগ করার অভ্যাস করা। এ ধরনের মুজাহাদা বা সাধনা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বরং যখন নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এ সকল মুজাহাদাও পরিত্যাগ করা হয়।

হযরত গাংগুহী (রহঃ) মুজাহাদা বা সাধনার দৃষ্টান্ত কাগজের ঐ মোড়ানো পাতার দ্বারা দিয়েছেন যাকে হাজার বার চেষ্টা করেও ঠিক করা সম্ভব হয় না, কিন্তু সামান্য সময় যদি বিপরীত দিকে মুড়িয়ে রাখা হয় তাহলে তা সোজা হয়ে যায়। তদ্রুপ মুজাহাদা বা সাধনার আসল উদ্দেশ্য হলো, নফসকে (প্রবৃত্তিকে) হালাল জিনিসে অভ্যস্ত করা। কিন্তু যে নফস হারাম জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাকে তখনই হালাল জিনিসে অভ্যস্ত করা যাবে, যখন কিছুদিনের জন্য তাকে জায়েয এবং হালাল জিনিস থেকেও দূরে রাখা হবে। এজন্যই হযরত উমরে ফারুক (রাযিঃ) বলতেনঃ

تركت تسعة اعشار الحلال خشية الربا

অর্থাৎ, আমরা (মুসলমানগণ) হারামের ভয়ে হালালের দশ অংশের মধ্য হতে নয় অংশকেই ত্যাগ করেছি। (কানযুল উম্মাল ৪:১৮৭)

আর এটা প্রকৃতপক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীরই সারাংশঃ

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ومن حال حوال الحمى أوشك أن يقع فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, হালাল এবং হারাম (উভয়ই) স্পষ্ট। এ দুটির মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত জিনিস আছে। আর যে ব্যক্তি চারণভূমির আশে-পাশে ঘুরে (অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত জিনিস ব্যবহার করে) সে ঐ চারণভূমিতে (অর্থাৎ হারামে) লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী হয়।

(সহীহ বুখারী ১:১০, সহীহ মুসলিম ২:২৮)

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, ঠিকমতো জামা'আতের পাবন্দী (যে, তাকবীরে উলাও যেন ছুটতে না পারে) তখনই সম্ভব হয়, যখন 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামাযের অভ্যাস করা হয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামাযের (যেটা একান্ত নফল) পাবন্দী এ উদ্দেশ্যে করে যে, এতে করে সে জামা'আতের সাথে নামায আদায়ে সমর্থ হবে, তাহলে এটাকেই মুজাহাদা বলা হবে। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি হারাম এবং অবৈধ কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য নিজেকে স্বল্পভাষী বানিয়ে নেয়, তাহলে এটাকেও মুজাহাদা বলা হবে।

পূর্ব যুগে সূফিয়ায়ে কেরাম এ উদ্দেশ্যে কঠিন কঠিন মুজাহাদা-সাধনা করতেন। বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট চারটি মুজাহাদার প্রচলন রয়েছে।

১ (ترك طعام) খাদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করা।

২ (ترك منام) নিদ্রাভ্যাস ত্যাগ করা।

৩ (ترك كلام) কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা।

৪ (ترك اختلاط مع الانام) মানুষের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করা।

এ যুগের মুজাহাদা বা সাধনা

কিন্তু যেহেতু আমাদের এ যুগের মানুষের শারীরিক গঠন এ ধরনের কঠোর মুজাহাদা বা সাধনা সহ্য করতে পারবে না, এজন্য শাইখ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এ সকল মুজাহাদার (সাধনার) মধ্য হতে (পরিত্যাগ) শব্দকে تقليل (স্বল্প করণ) শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত বলতেন, এ যুগে যদি পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। এজন্য এ যুগের মুজাহাদা হলো, উপরোক্ত বিষয়গুলোতে প্রয়োজনানুসারে স্বল্পতা সাধন করা। এক্ষেত্রেও হযরত খানভী (রহঃ) বলতেন যে, আমি পানাহার এবং নিদ্রা কম করার ব্যাপারে জোর দেই না। কারণ এর সীমা সম্পর্কে অবগত হওয়া পীর সাহেবের জন্যও মুশকিল হয়ে থাকে। কেননা মুরীদের (শারীরিক ও মানসিক) অবস্থার যথাযথ অবগতি ব্যতীত এগুলোর মধ্যে স্বল্পতা করলে অনেক সময় স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। অবশ্য হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে অপর দুটি বিষয় অর্থাৎ, تقليل كلام)কথাবার্তা কমিয়ে দেওয়া) এবং تقليل اختلاط مع الانام)মেলা-মেশা কম করা) এর উপর কঠোরভাবে পাবন্দী করা হতো। অর্থাৎ, হযরত থানবী (রহঃ) স্বীয় মুরীদদেরকে কথাবার্তা কম বলতে এবং মানুষের সাথে মেলামেশা কম করার প্রশিক্ষণ দিতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় আমল ও আখলাক সংশোধন করতে চায়, তার জন্য এ দুটি বিষয়ে মুজাহাদা (সাধনা) করা আবশ্যক। এ দুটি বিষয়ে মুজাহাদা করার নিয়ম পূর্বের লোকদের মধ্যেও দেখা যায়। হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) তার আংটিতে এ কথাটি খোদাই করিয়ে ছিলেন। قل الخير والا فاصمت অর্থাৎ, ভাল কথা বলো, অন্যথায় চুপ থাকো।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) থেকে দু'টি বিপরীতধর্মী বাক্য প্রসিদ্ধ আছে।

প্রথম বাক্য اقلل من معرفة الناس অর্থাৎ, মানুষের সাথে পরিচয় কম করো।

দ্বিতীয় বাক্য اكثر من معرفة الناس অর্থাৎ, মানুষের সাথে পরিচয় বেশী করো।

প্রকৃতপক্ষে এ দুটি কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ প্রথম বাক্যে মানুষ বলতে ঐ সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের দিক থেকে গাফেল। আর দ্বিতীয় বাক্য ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা দ্বীনদার এবং আল্লাহপাকের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

এ সকল মুজাহাদা পালনকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আর সে কথাটি এই যে, মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা নিঃসন্দেহে মুজাহাদার অংশ। কিন্তু এক্ষেত্রে কখনো যেন এ নিয়ত না হয় যে, লোকেরা খারাপ এজন্য তাদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাকি। কেননা এ নিয়ততো অহংকার ও আত্মম্ভরিতারই অপর নাম। বরং অন্য লোক থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে এ নিয়ত করা উচিত যে, আমার আমল খারাপ, আমি আত্মার রোগে আক্রান্ত, আমার এ রোগে অন্য কেউ যেন আক্রান্ত না হয়, এজন্য আমি লোক থেকে দূরে থাকি। পক্ষান্তরে কারো মনে যদি একথা আসে যে, অন্যেরা আমার চেয়ে খারাপ এবং আমার চেয়ে বেশী পাপী এজন্য তাদের থেকে দূরে থাকি, তাহলে এ ধরনের অহংকারের চেয়ে বাজারের লোকদের সাথে চলাফেরা করাও ভাল।

মোটকথা। কম কথা বলার এবং লোকজনের সাথে কম মেলামেশার অভ্যাস করলে সময়ও বাঁচবে এবং এভাবে অনেক গোনাহ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

দিল থেকে দুনিয়া বের করে দিন

الْعَدُ بِهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرْهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن رُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِيلُهُ فَلَا هَادِيَ لَشَرَ يَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

'হে লোক সকল নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য তাই তোমাদেরকে যেন দুনিয়ার এ জীবন ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর বিষয়ে তোমাদেরকে যেন ঐ (শয়তান) ধোঁকায় ফেলতে না পারে যে বড়ো ধোঁকাবাজ।"
সূরা ফাতের, আয়াত-৫

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন করা জরুরী। এ ছাড়া দ্বীন-দুনিয়া কোনোটাই পরিশুদ্ধ হতে পারে না। মূলত দুনিয়ার পরিশুদ্ধি দ্বীনের পরিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। এটা শয়তানের ধোঁকা যে, দ্বীন ছাড়াও দুনিয়া উৎকৃষ্ট, প্রশান্তিময়, আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক

হতে পারে। দুনিয়ার আসবাব-সামগ্রী ও উপায়-উপকরণ লাভ হওয়া ভিন্ন জিনিস, আর প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি, আরাম ও আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ হওয়া ভিন্ন জিনিস। দুনিয়ার উপায়-উপকরণ ও আসবাব-সামগ্রী দ্বীন ছাড়াও লাভ হতে পারে, টাকার স্তুপ হতে পারে, বাংলো তৈরী হতে পারে, কারখানা দাঁড়িয়ে যেতে পারে, গাড়ি লাভ হতে পারে, কিন্তু মনের প্রশান্তি দ্বীন ছাড়া লাভ হতে পারে না। এ কারণেই দুনিয়ার প্রকৃত শান্তিও কেবল সেসব আল্লাহর ওলী লাভ করে থাকেন, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ তা'আলার বিধানের অনুগামী করেন। এজন্য নিজের আত্মিক চরিত্র সংশোধন করা ছাড়া দ্বীন-দুনিয়া কোনোটাই সঠিক হতে পারে না। আত্মিক চরিত্রাবলির অন্যতম দু'টি বিষয়। একটি হলো আল্লাহর ভয় আরেকটি হলো তার রহমতের আশা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এগুলো অর্জন করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

আত্মার সুস্থতা জরুরী কেন?

মানুষ মনে করে যে, তাসাওউফ শরীয়ত থেকে ভিন্ন কোনো জিনিস। বরং, এটা শরীয়তেরই একটা অংশ। মানুষের বাহ্যিক কাজ-কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যতো বিধান রয়েছে তার সমষ্টির নাম শরীয়ত। আর অভ্যন্তরীণ আমল-আখলাক সম্পৃক্ত বিধানসমূহের সমষ্টির নাম তরীকত ও তাসাওউফ। আত্মার গুরুত্ব এ জন্য বেশি যে, এটা ঠিক না হলে বাহ্যিক আমলও বেকার হয়ে যায়। মনে করুন আমলের মধ্যে ইখলাস নেই। ইখলাস অর্থ কি? ইখলাস অর্থ হলো সব কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তালাশ করা। মানুষ যে কোনো কাজ করবে কেবল আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য করবে। এটা হলো ইখলাস। ইখলাস একটি অভ্যন্তরীণ আমল। কোনো ব্যক্তি যদি ইখলাস ছাড়া নামায পড়ে, এজন্য নামায পড়ে যে, মানুষ আমাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে করবে, ইবাদতগুজার মনে করবে, তার বাহ্যিক আমল তো ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু ভিতরে ইখলাসের প্রাণ নেই এজন্য তার বাহ্যিক এ আমল বেকার। বরং গুনাহের কারণ হবে। হাদীস শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى يُرَابِي فَقَدْ أَشْرَكَ

'যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়লো সে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলো।"
সে যেন আল্লাহর সঙ্গে মাখলুককে শরীক করলো। আল্লাহর পরিবর্তে মাখলুককে খুশি করতে চায়। এজন্য বাহ্যিক আমলকে ঠিক করার জন্যও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি জরুরী। এটা না হলে বাহ্যিক আমলও বেকার হয়ে যাবে।

আত্মা মানুষের আমলের উৎস।
মানুষের যাবতীয় আমলের মূল উৎস ও কেন্দ্র তার আত্মা। সর্ব প্রথম মানুষের অন্তরে আমলের ইচ্ছা সৃষ্টি হয় তারপর তার দ্বারা ঐ আমল সম্পাদিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ জুমার নামায

আদায় করার জন্য মসজিদে আসলেন। তখন সর্বপ্রথম তার অন্তরে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে যে, আজকে জুমার দিন। মসজিদে গিয়ে আমার জুমার নামায আদায় করা উচিত। প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে, তারপর ঐ ইচ্ছা পোক্ত হয়েছে। মনের অলসতার বিরোধিতা করে তাকে ইচ্ছাকে সংকল্পে পরিণত করতে হয়েছে। এই সংকল্পের ফলে তার পা মসজিদের দিকে ধাবিত হয়েছে। তিনি যদি সংকল্প না করতেন তাহলে তার পা মসজিদের দিকে চলতে আরম্ভ করতো না। হ্যাঁ, কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে তার হাত-পা ইচ্ছা ছাড়াও নড়াচড়া করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, অনুভূতি আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে ইচ্ছা না জাগলে কোনো কাজ করতে পারবে না। সে কাজ ভালো হোক বা মন্দ। এতে বোঝা গেলো যে, মানুষের সমস্ত কাজের উৎস তার আত্মা।

আত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ গচ্ছিত রাখা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা 'দিল' নামক বিস্ময়কর এক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে রক্তের একটি টুকরা মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐ রক্তের টুকরার সঙ্গে কিছু সূক্ষ্ম শক্তি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। সেসব শক্তি চোখে দেখা যায় না। কোনো ল্যাবরেটরিতে এগুলোর টেস্টও করা যায় না। কিন্তু এসব শক্তি আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আত্মার মধ্যে বিভিন্ন কামনা বাসনা সৃষ্টি হয়। এ কাজ করবো, ও কাজ করবো। অন্তরেই এসব বাসনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। অন্তরেই আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই ক্রোধ সৃষ্টি হয়। অন্তরেই চাহিদা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই দুনিয়া জোড়া কামনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই বেদনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই আনন্দ সৃষ্টি হয়। এসব কিছুই আত্মাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।
কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা আত্মার রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে, সে সফলকাম হবে।' (সুরা শামস-৯)

এই আয়াতের তাফসিরে হাসান বসরী (রা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে ওই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাবে তথা আত্মাকে সংশোধন করাবে এবং আত্মাকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর উদ্বুদ্ধ করবে। (তাফসিরে মাজহারি)

উপরোল্লিখিত বিশদ আলোচনা এ কথা প্রমাণ করে যে মানুষের শরীরের মতো মানুষের অন্তরও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যেসব রোগের একেকটি এত বেশি ক্ষতিকর যে একটি রোগই যেকোনো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শরীর রোগাক্রান্ত হলে যেমনি আমরা তার চিকিৎসা করে থাকি, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা করাও জরুরি। বরং আত্মার রোগের চিকিৎসা শরীরের রোগের তুলনায় অনেক বেশি জরুরি।

আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা না করানোর ফল

আত্মার রোগের চিকিৎসা না করালে শহীদ, আলেম ও দানবীরদের করুণ অবস্থা হবে। যেমন হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহীদ (ধর্মযুদ্ধে প্রাণদানকারী)। তাকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আনা হবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা (নেয়ামতপ্রাপ্তির কথা) স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তুমি এসব নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করোনি; বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ যে তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদের) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনি ইলম শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে আর সে কোরআন শরিফও পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকেও দুনিয়ার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তুমি কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অন্যকেও তা শিখিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরআন মজিদ পড়েছি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় আর এজন্য কোরআন পড়েছ, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের অর্থ-সম্পদ দান করে বিত্তবান বানিয়েছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামতের মোকাবিলায় তুমি আমার জন্য কী করেছ? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো তার একটিও আমি হাতছাড়া করিনি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য দান করেছ, যাতে করে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (সহিহ মুসলিম, হা. নং-১৯০৫)

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত, নিজ আত্মার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কোনো হক্কানি পীর বা শায়খকে নিজ আত্মার অবস্থা জানিয়ে আত্মার চিকিৎসা করা। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে তাওফিক দান করুন।